শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা বিলম্ব কেন

আবুল মোমেন
১০ জুলাই ২০২৪, ১২:০০ এএম

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের মধ্যে আছেন। শিক্ষার্থীরা আন্দোলন কেবল ক্যাম্পাসে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তারা রাজপথে নেমে এসেছেন। গণমাধ্যমের খবরে জানা যাচ্ছে, সরকার এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কোটাবিরোধী আন্দোলন নিয়ে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার সময় দিয়েও তা বাতিল করেছে। মনে হচ্ছে তাদের প্রত্যয় স্কিমের আন্দোলন নিয়ে সরকার বিচলিত নয়।

প্রত্যয় স্কিম একেবারে সাম্প্রতিক ইস্যু আর কোটা বিষয়টি বেশ পুরনো। প্রথমে শুরু হয়েছিল শিক্ষকদের আন্দোলন, তাই সেটি নিয়েই প্রথমে আলোচনা করা যাক। প্রত্যয় স্কিম হলো সরকারের জাতীয় পেনশন স্কিমের অন্তর্গত একটি বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের চাকরিতে ভবিষ্যৎ তহবিল (প্রভিডেন্ট ফান্ড) এবং চাকরি শেষে এককালীন পারিতোষিক (গ্র্যাচুইটি) চালু ছিল। এ ছাড়া তারা অবসরের পর আজীবন নিজ নিজ সর্বশেষ ইনক্রিমেন্ট

সুবিধাও পেতেন। বছরে দুটি উৎসব-ভাতা (বোনাস) পেতেন। প্রত্যয় স্কিমে শিক্ষকরা মূল বেতনের ৫ শতাংশ হারে জমা দেবেন এবং চাকরি শেষে সরকার হিসাব অনুযায়ী লাভ যোগ করে থোক টাকা দেবে। এর বিপরীতে বোনাসসহ বিদ্যমান কোনো আর্থিক সুবিধা থাকবে না। সম্ভবত ভবিষ্যতে শিক্ষকদের অবসরের বয়স বর্তমান ৬৫ বছর থেকে ৬০ বছরে নামিয়ে আনার প্রস্তাবও রয়েছে। অবশ্য এ স্কিম এ বছরের ১ জুলাই থেকে চালু হওয়ার কথা অর্থাৎ যারা আগে থেকে চাকরিতে আছেন তাদের ক্ষেত্রে আগেকার নিয়ম বলবৎ থাকবে। তবে শিক্ষকরা এতে সরকারের আশ্বাসের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না, তার ওপর যারা এ মাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে প্রবেশ করবেন তাদের কথাও তারা ভাবছেন।

শিক্ষকদের এই দুর্ভাবনার পেছনে অন্য একটি সুদূরপ্রসারী ও গুরুতর ভাবনা-দুর্ভাবনাও কাজ করছে। এমনিতেই আমাদের দেশে বেতন-ভাতায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের চাকরিও আকর্ষণ হারিয়েছে। এ দেশে প্রশাসনের আমলা ও সরকারের অন্যান্য ক্যাডারভিত্তিক প্রশাসনিক চাকরির আকর্ষণই বেশি। প্রত্যয় স্কিমের বাধ্যবাধকতার কারণে ভবিষ্যতে এ চাকরির আকর্ষণ আরও নেমে যাবে। তখন মেধাবীদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করা দুরূহ বা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়বে। কারণ নতুন ব্যবস্থায় প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকের পক্ষে বর্তমান দ্রব্যমূল্যে মর্যাদা রক্ষা করে জীবনযাপন কঠিন হবে। নতুন ব্যবস্থায় শিক্ষকদের আর্থিক ক্ষতি স্পষ্ট, মর্যাদা এবং ভবিষ্যৎ নিয়েও দুশ্চিন্তার কারণ বাস্তবসম্মত। এখনকার শিক্ষকরা যদি কেবল নিজেদের দিকটি বিবেচনা করে ভবিষ্যতের জন্য সরকার যে ব্যবস্থা করছে তার সমস্যা নিয়ে এখনই কথা না বলেন তা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের দায়ী করবে এবং তারাও নিজেদের কাছে অপরাধী হয়ে থাকবেন। ফলে তাদের আন্দোলনকে সমীচীন নয় বলা মুশকিল।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নেতৃত্বে রয়েছেন যারা, তারা তো সরকার-সমর্থক হিসেবেই পরিচিত। তা হলে তাদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক উভয় পদ্ধতিতেই বসতে অসুবিধার কারণ কী, তা বোঝা যাচ্ছে না। একবার বসার তারিখ দিয়ে সরকার পক্ষ আবার পিছিয়ে যাওয়ায় মনে হচ্ছে সরকারপ্রধান এ বিষয়ে আরও একটু ভাবতে চান। তবে আমরা মনে করি মাঠ পর্যায়ে আন্দোলনের বহর বাড়তে না দেওয়াই ভালো। যে সমস্যাটি সমাধানযোগ্য এবং যে অচলাবস্থা নিরাময়যোগ্য তাতে কালক্ষেপণ একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়।

এই সূত্রে আমরা বলব, আমাদের দেশে শিক্ষা এখনো যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না। এটা বোঝা যায় শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ এবং সব স্তরের শিক্ষকদের বেতন কাঠামো দেখলে। এই দুই ক্ষেত্রেই আমরা প্রতিবেশী দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে পিছিয়ে আছি। এ কথাও মনে রাখা দরকার, সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে মানুষের আয়-উপার্জন যুক্ত। শিক্ষকদের পেছনে ফেলে রেখে প্রকৃত উন্নয়ন বা টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ মানবসম্পদই হলো বর্তমান বিশ্বের মূল সম্পদ। এ সম্পদ তৈরি করেন শিক্ষকরা। ফলে তাদের চাকরির বিষয়টি যে অগ্রাধিকারের বিষয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন প্রধানমন্ত্রী চীন চলে যাওয়ায় আলোচনা বা সমাধানের সম্ভাবনা পিছিয়ে গেল। এর অর্থ হলো অচলাবস্থা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। আমরা আশা করেছিলাম প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরের আগে অন্তত শিক্ষক আন্দোলন প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করে যাবেন এবং ফিরে এসে বৈঠকের মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান করা হবে।

এদিকে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে অচলাবস্থা আরও জোরদার হয়েছে শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে। বিষয়টি অবশ্য সর্বোচ্চ আদালতের বিবেচনায় রয়েছে। ফলে সোজা ভাবনায় বলা যায়, আপাতত আদালতের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া সব পক্ষেরই করণীয় কিছু নেই। কিন্তু তার মধ্যেই শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমেছেন এবং তারা এ বিষয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতি চান। আমরা জানি কোটার বিষয়টি সরকারের আবেদনেই সর্বোচ্চ আদালতে রয়েছে। ফলে বল এখন কোর্টে হলেও আদতে তা সরকারের কোর্টেও রয়েছে। সেদিক থেকে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া, বিশেষত জনদুর্ভোগ কমানোর জন্য বিষয়টি কেবল শিক্ষার্থীদের বিবেচনার ওপর ছেড়ে না দিয়ে দ্রুত আলোচনার সূত্রপাতও করা যেত।

দেখা যাচ্ছে কোটা সংস্কার আন্দোলনের জনপ্রিয়তা ব্যাপক। তাতে তরুণদের অংশগ্রহণের বহর ও আন্তরিকতা দেখে বোঝা যায় দেশে বর্তমানে শিক্ষিত তরুণদের কর্মসংস্থানের সংকট কত গভীর। আমরা দেখছি দেশের তরুণদের মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম হতাশা রয়েছে। এ অবস্থা খুব সাম্প্রতিকও নয়, তা বোঝা যায় সরকারি চাকরিতে ঢোকার বয়সসীমা বাড়ানোর দাবির বিষয়টি থেকে। লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার তরুণের পক্ষে সাম্প্রতিক স্টার্টআপ ব্যবসা বা অন্য কোনো ব্যবসা শুরু করা সহজ নয়। আবার সরকারি খাত ছাড়া দেশে চাকরির বাজার অত্যন্ত সীমিত। আমাদের দেশে বেসরকারি খাতের বিকাশ আশানুরূপ হয়নি। ফলে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষিত তরুণরা উপার্জনের সংকটে রয়েছেন। সরকারকে এসব দিকও ভাবতে হবে। দেশের তরুণ সমাজকে হতাশার মধ্যে রেখে, তাদের ভবিষ্যৎ ভাবনা গভীর দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন রেখে সত্যিই কি উন্নত দেশ গড়ে তোলা সম্ভব? বরং এ রকম বাস্তবতায় আশঙ্কা থাকে, যে কোনো সময় দেশে সামাজিক অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তরুণদের কোটা সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে এ ধরনের আলামত যে একদম নেই তা বলা যাবে না। আবার এর জন্য কেবল বিরোধী দলের দিকে ইঙ্গিত করলেও চলবে না। শিক্ষার্থীরা কোটাবিষয়ক কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে, সরকার বরং বিষয়টি ভাবতে পারে।

শেষ করার আগে প্রসঙ্গত বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধের অর্ধশতাধিক বছর পর চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা থাকা উচিত নয়। সন্তান ও উত্তর প্রজন্মের জন্য বংশপরম্পরায় এ ধরনের সুযোগ রাখা কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। এ ধরনের ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমাদের প্রজন্ম এবং তার আগে-পরে যারা স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন সেটা ছিল দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার সর্বোচ্চ প্রকাশ। সেদিন মানুষ আত্মত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েই এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারা ছিল সেই প্রজন্মের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। এই সম্মান এবং নিঃস্বার্থ বীরত্ব ও ত্যাগের মর্যাদা ক্ষুণœ হয় যদি তা আর্থিক লাভের জন্য

বিনিয়োগ বা বিনিময়যোগ্য হয়। বীররা বীরত্বের পদক (গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড) পাবেন, স্বাস্থ্যসেবাসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সেবা খাতে বিশেষ সুবিধা পাবেন। তাদের সন্তানরাও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে এ সুবিধা পেতে পারেন। কেউ দুস্থ হলে, অসুস্থ হলে তার পাশে রাষ্ট্র দাঁড়াবে, কিন্তু চাকরিতে বাড়তি সুবিধা প্রদান ঠিক নয়। অন্যান্য যে সুবিধার কথা বলা হলো তা-ও সন্তান পর্যন্ত চলে, এর বেশিদূর দিতে চাইলে তা নাগরিক সুবিধার বৈষম্য তৈরি করবে এবং স্বাভাবিক ন্যায়নীতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থি হবে। এ বিষয়গুলোও ভাবা দরকার বলে মনে করি।

আবুল মোমেন : কবি, প্রাবন্ধিক ও সম্পাদক দৈনিক আমাদের সময়